 প্রবন্ধাবলি, খণ্ড : ১১, জুলাই ২০১৯, ৫৩-৭০

মৃণাল সেনের চলচ্চিত্রে মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনের উপস্থাপন

শাওন্তী হায়দার[১]
সঞ্জয় বসাক পার্থ[২]

সারসংক্ষেপ

বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে যে কজন চলচ্চিত্রকারের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে, তাঁদের মধ্যে অন্যতম মৃণাল সেন। তাঁর চলচ্চিত্রে সমকালীন রাজনীতির দৈন্যদশা, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা, শ্রেণি-বিভাজন ইত্যাদি বিষয় যেমন উঠে এসেছে, তেমনই সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের জীবন-সংগ্রামও সমান গুরুত্বপূর্ণভাবে ফুটে উঠেছে। তাঁর নির্মিত চলচ্চিত্রগুলো কেবল চলচ্চিত্র হয়ে থাকেনি, বরং হয়ে উঠেছিল তৎকালীন সমাজ বাস্তবতার দর্পণস্বরূপ। দর্শককে নিছক সন্তুষ্টি প্রদান নয়, বরং নিজের চলচ্চিত্রের মাধ্যমে তিনি দর্শকের মনোজগতে ধাক্কা দিয়েছেন। বিশেষ করে মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবনের বিভিন্ন টানাপোড়েন ও বাস্তবতাকে তিনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন। বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসের একজন কিংবদন্তি হিসেবে তিনি যেভাবে তাঁর ক্যামেরায় মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখানোর প্রয়াস পেয়েছেন, সেটি তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিশ্লেষণ করা গবেষকদ্বয়ের কাছে যৌক্তিক ও সময়োপযোগী মনে হয়েছে। গবেষণা প্রবন্ধটিতে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের জন্য স্টুয়ার্ট হলের রেপ্রিজেন্টেশন তত্ত্ব ও রোলাঁ বার্থের সেমিওটিক্স তত্ত্বের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। প্রবন্ধটিতে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের মাধ্যমে মৃণাল সেনের তিনটি চলচ্চিত্র- 'ইন্টারভিউ', 'একদিন প্রতিদিন' ও 'খারিজ'-কে নমুনা হিসেবে বাছাই করা হয়েছে। আধেয় বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাছাইকৃত চলচ্চিত্রগুলোর অন্তর্নিহিত অর্থ গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

মূল শব্দ: মৃণাল সেন, বাংলা চলচ্চিত্র, মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবন, আধেয় বিশ্লেষণ, সেমিওটিক্স, ইন্টারভিউ, একদিন প্রতিদিন, খারিজ।

ভূমিকা

'শেষ পর্যন্ত সিনেমার রাজ্যেই চলে এলাম! আশ্চর্য, আমি কোনদিনই স্বপ্নেও ভাবিনি যে আমি ছবি তৈরি করব। এটা নিছক একটা অ্যাকসিডেন্ট'। ঠিক এমনভাবেই উপমহাদেশের বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার মৃণাল সেন তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ *তৃতীয় ভুবন* শুরু করেছেন (২০১১, পৃষ্ঠা: ১)।

---

[১] সহযোগী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ইমেইল : shaonti.mcj@du.ac.bd

[২] প্রভাষক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (বিইউপি); ইমেইল : sanjoypartha33@gmail.com

একই বইয়ের ভূমিকায় তিনি আরও বলেন:

> আমি সিনেমা নিয়ে ঘর করি। আমি সিনেমার গঠনপদ্ধতি ও পরিবেশ-রচনার জটিল প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িয়ে থাকি। ক্রমাগত পট-পরিবর্তন, নান্দনিক উৎকর্ষ সিনেমামনস্কতার নানা রঙেঢঙে বিশিষ্ট থেকে বিশিষ্টতর হয়ে ওঠার যে ইতিহাস, সেই ইতিহাসের নিত্যসঙ্গী হওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। থামা নেই। আর, প্রতি মুহূর্তে বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও মননের প্রথাসিদ্ধ নিয়ম ভেঙে বেনিয়মের খেলায় মেতে থেকেছি। যা করেছি, যা করে চলেছি, ঠিক বা বেঠিক, পরোয়া করিনি কখনও। ভাবনা কীসের! সিনেমার শেষ কোথায়, আছে কি নেই, কে বলবে?

বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এক স্বর্ণখচিত নাম মৃণাল সেন। আমরা যারা বিনোদনের জন্য চলচ্চিত্র দেখি, তারা একাধারে জীবনের গল্প যেমন দেখতে চাই, তেমনই আবার স্বাভাবিক জীবনের অলীক গল্পও যেন প্রত্যাশা করি। কখনও দেখতে চাই নির্ঝঞ্ঝাট, সমান্তরাল বা ছকে বাধা জীবনের প্রতিচ্ছবি, আবার দেখতে চাই যা কখনও হবার নয়, তাও। কিংবদন্তিসম চলচ্চিত্রকারেরা এই দুই ধরনের ভাবনাকেই ধারণ করে তাঁদের চলচ্চিত্রগুলোকে সেলুলয়েডের পর্দায় তুলে ধরেন অসাধারণভাবে। আর এ কারণেই তাঁদের জীবন ও কাজ সম্পর্কে চারপাশের মানুষের থাকে প্রচণ্ড কৌতূহল। বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে তেমনই এক ভিন্ন জগতের মানুষ মৃণাল সেন। যে সকল চলচ্চিত্রকারের হাত ধরে বাংলা চলচ্চিত্র বিশ্ব দরবারে পরিচিত হয়েছে, মৃণাল তাঁদের মধ্যে একজন। কেবল একজন বললে ভুল হবে, বলতে হবে শীর্ষস্থানীয়।

পূর্ববঙ্গে জন্ম নেয়া মৃণাল সেন নিজের নির্মিত সিনেমার মাধ্যমে যেন স্বয়ং নিজের জীবনযাত্রা, অর্থাৎ মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবনযাত্রাকেই সেলুলয়েডে তুলে ধরেছেন। গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশক থেকে শুরু করে নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত ভারতের পশ্চিমবঙ্গের সমাজকাঠামোয় যে অসঙ্গতি দেখা গিয়েছিল, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মৃণাল সেন সেখান থেকেই তাঁর চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করেছেন। তাঁর চলচ্চিত্রে তৎকালীন সমাজে রাজনৈতিক দীনতা, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা ইত্যাদি বিষয় ফুটে উঠলেও অন্যতম প্রকটভাবে ফুটে উঠেছে সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের নিত্য জীবন-সংগ্রাম। মধ্যবিত্ত শ্রেণির বেকারত্ব, দারিদ্র্য, অসহায়ত্ব এমনকি কাপুরুষোচিত পলায়নপর মনোভাবকেও অকপটে পর্দায় তুলে ধরেছেন তিনি। কেবল বিষয়বস্তুর দিক থেকে নয়, নির্মাণশৈলির দিক থেকেও মৃণাল ছিলেন স্বতন্ত্র। একদিকে যেমন বাঙালি দর্শকদের পরিচয় করিয়েছেন নতুন ঘরানার নির্মাণশৈলির সঙ্গে, অপরদিকে নির্মম বাস্তবতাসম্পন্ন বিষয়বস্তু দিয়ে ভেঙে দিয়েছেন দর্শকদের ভ্রম। বাংলা চলচ্চিত্রে নির্মাণশৈলি নিয়ে এমন পরীক্ষা-নিরীক্ষা মৃণাল সেনের কাজেই প্রথম দেখা যায়।

গবেষণার পটভূমি

গত শতাব্দীর সত্তরের দশকে কলকাতা যখন নানাবিধ সামাজিক সমস্যায় ধুঁকছে, একদল প্রতিবাদী তরুণ তখন সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে সশস্ত্র বিপ্লবের দিকে ঝুঁকে পড়ে। পুলিশের সাথে এই তরুণদের সংঘর্ষ তখন হয়ে দাঁড়ায় পশ্চিমবঙ্গের নৈমিত্তিক ঘটনা। কিন্তু এই রাজনৈতিক অস্থিরতার আঁচও এক শ্রেণির তরুণদের মনে কোনো প্রকার আলোড়ন তুলতে ব্যর্থ হয়। উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিবেশ নয়, বরং তাদের সমস্ত চিন্তাজুড়ে ছিল ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির তাড়না। কীভাবে পরিবার নিয়ে আরেকটু উন্নত জীবন-যাপন করা যাবে, এটিই যেন ছিল তাদের একমাত্র মাথাব্যথা, ঠিক যেমনটা দেখতে পাওয়া যায় মৃণাল সেনেরই 'ইন্টারভিউ' সিনেমায়। পুরো কলকাতার

রাজনৈতিক পরিবেশ যখন ভীষণ উত্তপ্ত, তখনও রঞ্জিত নামের এক মধ্যবিত্ত তরুণের ধ্যানজ্ঞান জুড়ে কেবল একটি বিদেশি কোম্পানিতে চাকরি পাওয়ার স্বপ্ন। মা ও বড় বোনকে নিয়ে কলকাতার একটি পুরোনো বাড়িতে ভাড়া থাকা রঞ্জিত ভালো থাকার আশায় বর্তমান চাকরির চেয়ে ভালো একটি চাকরি প্রত্যাশা করে। যে কারণে তার সমবয়সী তরুণেরা যখন প্রতিবাদে মুখর, সে তখন প্রায় দ্বিগুণ বেতনের বিদেশি কোম্পানির চাকরির স্বপ্নে বিভোর। শুধু 'ইন্টারভিউ'-তেই নয়, নিজের অনেক চলচ্চিত্রেই মধ্যবিত্ত শ্রেণির এমন মানসিক দীনতার চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন মৃণাল সেন। মূলত 'ইন্টারভিউ'-তে রঞ্জিতের এমন চিত্রায়ণই আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছে মৃণাল সেনের অন্যান্য চলচ্চিত্রে মধ্যবিত্ত সমাজের উপস্থাপন কেমন, সেটি আরও গভীরভাবে খতিয়ে দেখার জন্য।

গবেষণা প্রশ্ন

মূলত নিম্নোক্ত প্রশ্নটিকে সামনে রেখে এই গবেষণাটি সম্পন্ন করা হয়েছে:

- মৃণাল সেন তাঁর চলচ্চিত্রে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির নাগরিক জীবনের নিত্যদিনের দোটানা, সংকট ও টানাপোড়েনগুলোকে কীভাবে চিত্রায়িত করেছেন?

গবেষণার যৌক্তিকতা

দেশভাগ-পরবর্তী উদ্ভূত পারিবারিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক সব ধরনের সংকটই উঠে এসেছে মৃণাল সেনের চলচ্চিত্রে। তাঁর চলচ্চিত্র যেন হয়ে উঠেছিল সমকালীন সমাজ বাস্তবতার আধার। মধ্যবিত্ত শ্রেণিকেই রাজনৈতিক আন্দোলনের নিয়ন্ত্রক বলে মনে করতেন মৃণাল। এই কারণেই প্রতিবাদী ও রাজনৈতিক চলচ্চিত্র নির্মাণের মাধ্যমে বারবার তিনি মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে তাদের করণীয় সম্পর্কে সজাগ করতে চেয়েছেন। তাঁর অনেক চলচ্চিত্রই নাগরিক জীবনের টানাপোড়েনের ফসল (ভৌমিক, ২০১৫)। সে কারণেই বাংলা চলচ্চিত্রের একজন দিকপাল হিসেবে মৃণাল সেন তাঁর একাধিক কাজে মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনকে কীভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, সেটি বিশ্লেষণ করা আমাদের কাছে যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক রচনা পর্যালোচনা

মূলধারার বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রের জোয়ারের বাইরে গিয়ে বাংলা চলচ্চিত্রের সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি ধারা নির্মাণের জন্য সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন ও ঋত্বিক ঘটকের নাম এক কাতারে উচ্চারিত হলেও চিন্তা-চেতনা ও শিল্পভঙ্গির দিক থেকে তিনজনই ছিলেন স্বতন্ত্র। তরুণ বয়সে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়, ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সঙ্গে মেলামেশা এবং কমিউনিজম সম্পর্কে প্রচুর পড়াশোনার বদৌলতে শুরু থেকেই মৃণাল সেন ছিলেন একজন রাজনীতি-সচেতন মানুষ। রাজনীতিকে পিঠ দেখানো নয়, বরং রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন তিনি। যে কারণে তাঁর অনেক চলচ্চিত্রে রাজনীতিই হয়ে উঠেছে মুখ্য উপজীব্য।

সোমেশ্বর ভৌমিক তাঁর 'মৃণাল সেনের অন্তহীন অন্বেষণ' প্রবন্ধে দাবি করেছেন, মৃণাল সেনের চলচ্চিত্রকে মোটাদাগে চারটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। তাঁর মতে, মৃণাল সেনের পরিচালক জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়টির শুরু গত শতাব্দীর ষাটের দশকের শেষভাগে, একাধিক রাজনৈতিক ও প্রতিবাদী চলচ্চিত্র নির্মাণের মাধ্যমে। ওই সময়টিতে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক অঙ্গনে যে অস্থিরতা দেখা দেয়, তার ঢেউ শুধু রাজনীতিতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং চলচ্চিত্র ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও আঁছড়ে পড়ে। যথারীতি রাজনৈতিক অস্থিরতার এই প্রতিফলন দেখা যায় মৃণাল সেনের চলচ্চিত্র নির্মাণেও। তাঁর এই পর্যায়ের চলচ্চিত্রগুলোতে

কলকাতার তৎকালীন সমাজসংকটের উপস্থিতি প্রবলভাবে লক্ষণীয়। কলকাতার মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ, তাদের মূল্যবোধ ও জীবনসংকটই হয়ে ওঠে তাঁর চলচ্চিত্রের মূল উপজীব্য (ভৌমিক, ২০১৫)।

যখন থেকে মৃণাল সেন কলকাতার মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে কেন্দ্রবিন্দু করে চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু করলেন, তখন থেকে তিনি ছবিতে ঘটনার চেয়ে ঘটনার প্রতিক্রিয়া ও তাৎপর্যের ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করতে শুরু করলেন। ঘটনার ধারাবাহিক বর্ণনা দেওয়ার বদলে টুকরো টুকরো ছবি তৈরি করা এবং সেগুলোকে জোড়া লাগিয়ে মন্তাজ পদ্ধতি ব্যবহার করে বক্তব্য উপস্থাপন করার দিকেই তিনি বেশি মনোযোগী হন (আহমদ, ২০১৮)।

চলচ্চিত্রকে নিছক বিনোদনের মাধ্যম নয়, বরং সাধারণ মানুষের মনে চিন্তার খোরাক জোগানোর হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন মৃণাল সেন। তিনি চেয়েছিলেন, চলচ্চিত্রের প্রতিটি দৃশ্য যেন দর্শককে চিন্তা করতে বাধ্য করে, প্রশ্নে প্রশ্নে জর্জরিত করে তোলে। সে কারণেই তিনি বলেছেন:

> এই মুহূর্তে আমাদের সময়টা নানা সমস্যায় জর্জরিত। স্ববিরোধিতায়, দ্বন্দ্বে আমাদের সামাজিক, রাজনৈতিক জীবন আজ পর্যুদস্ত, দিশেহারা। আত্মসমালোচনার ব্যাপারটাও এ কারণে বড় জরুরি হয়ে পড়েছে আমাদের জীবনে। তাই আমি আমার সাধ্যমতো, আমার বুদ্ধি-বিবেচনা অনুযায়ী আমার ছবিগুলোর মধ্য দিয়েই ওই কাজে জড়িয়ে পড়েছি। নিজের ভেতর ঢুকে কিছু জরুরি প্রশ্ন করেছি নিজেকে, নিজেদের বোঝার জন্য, সমাজকে ধরার জন্য (ভৌমিক, ২০১৫)।

বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবনকে মৃণাল সেন যতটা বহুমাত্রিকভাবে পর্দায় তুলে এনেছেন, আর কোনো পরিচালক সেটি করে দেখাতে পারেননি। 'কলকাতা ট্রিলজি' নামে পরিচিত তাঁর বিখ্যাত তিনটি চলচ্চিত্র- ইন্টারভিউ (১৯৭০), কলকাতা ৭১ (১৯৭২) ও পদাতিক (১৯৭৩) দিয়েই মূলত মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবন সংগ্রামকে দর্শকের সামনে নিয়ে আসেন তিনি (Jalal, 2018)। বেশ কিছু রাজনৈতিক প্রতিবাদী চলচ্চিত্র নির্মাণের পর 'একদিন প্রতিদিন' দিয়ে আবার ফিরে আসেন মধ্যবিত্ত সমাজের মূল্যবোধের সংকটের কাছে। এক কর্মজীবী নারীর সারা রাত বাড়ি না ফেরার গল্প চিত্রায়ণের মাধ্যমে মধ্যবিত্তদের 'সম্মানের' প্রতি প্রশ্ন ছুঁড়ে মেরেছেন। এখানেই শেষ নয়, 'খারিজ'-এও তুলে ধরলেন অর্থনীতির নোংরা সুতোর আড়ালে মধ্যবিত্ত সমাজের দ্বিচারিতা (মোকাম্মেল, ২০১৮)।

মধ্যবিত্ত জীবনের সংগ্রাম দেখানোর পাশাপাশি মৃণাল সেন একইসাথে এই শ্রেণির মানুষের অস্তিত্ব এবং মূল্যবোধের সংকটকেও তুলে ধরতে চেয়েছেন, যা তাঁর চলচ্চিত্রের মধ্যবিত্ত শ্রেণির দর্শকদের মনোজগতে ধাক্কা দেয়। মৃণাল লক্ষ করেছেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালো মেঘ ঘনিয়ে আসার সময় থেকেই মূলত মধ্যবিত্ত শ্রেণির অধোগতির শুরু। কলকাতার মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে মূল্যবোধের তীব্র সংকট দেখা দিতে লাগল, বেপরোয়া লোকজন যেন নিজেদের চাহিদা ও মানসিক প্রবৃত্তি অনুযায়ী মূল্যবোধের বেড়াজাল ভেঙে ফেলার সংকল্পে অটল। মধ্যবিত্ত অস্তিত্বের সবচেয়ে বড় সংকট যেটি, সেই ভদ্রতার মুখোশকেই বিসর্জন দেয় তারা। যারা অপেক্ষাকৃত ভীরু, তারা এই ক্ষয়ের ছোঁয়া সতর্কভাবে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও পুরোপুরি সফল হয় না, সামাজিক চাপে বাধ্য হয় ছোটখাটো দুর্নীতির পথে পা বাড়াতে (ভৌমিক, ২০১৫)।

মধ্যবিত্ত শ্রেণির দ্বিচারিতাকে সামনে এনে সমালোচনা করতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি মৃণাল সেন। তিনি ভালো করেই জানতেন, বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের ভেতরটা কত ফাঁপা এবং এই সমস্ত কিছুই তিনি করেছেন নিজস্ব ভঙিমায়। বিষয়বস্তু হোক কিংবা নির্মাণশৈলি, সবকিছুতেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন।

নিজের লেখা *মন্তাজ: লাইফ, পলিটিক্স, সিনেমা* (২০০২) বইতে সেটি স্বীকার করেছেন স্বয়ং মৃণাল। তিনি লিখেছেন, 'নিজের তাগিদেই আমি সবসময় নতুন কিছু দেখাতে চেয়েছি, প্রচলিত রীতি-নীতির শেকল ছিঁড়ে ফেলতে চেয়েছি এবং অনুভূতি প্রকাশের নতুন নতুন মাধ্যম ব্যক্ত করতে চেয়েছি' (Shahid, 2019)। মধ্যবিত্ত শ্রেণির বাস্তবতাকে উপেক্ষা করার বদলে বরং সেগুলোর সমালোচনা করাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন তিনি। নিজের বানানো 'খারিজ' চলচ্চিত্র সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'খারিজে যেমনটা দেখানো হয়েছে, তেমন কোনো ভৃত্য আমাদের বাড়িতে মারা যায়নি। কিন্তু এই চলচ্চিত্রটির মাধ্যমে আমি যে সমাজে বাস করি, সেই সমাজের লোকেদের প্রতি একটা বার্তা দিতে চেয়েছিলাম। এটি আমাদের শহুরে সমাজের বাস্তবতারই চিত্র' (Chatterji, 2020)।

তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

মৃণাল সেনের চলচ্চিত্রে মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনের উপস্থাপন বিশ্লেষণের জন্য এই গবেষণায় স্টুয়ার্ট হলের[১] 'রেপ্রিজেন্টেশন তত্ত্ব' এবং রোলাঁ বার্থের[২] 'সেমিওটিক্স তত্ত্ব' ব্যবহার করা হয়েছে।

রেপ্রিজেন্টেশন তত্ত্ব

স্টুয়ার্ট হলের বক্তব্য অনুযায়ী, 'রেপ্রিজেন্টেশন হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোনো একটি বিষয়কে প্রতিনিধিত্ব করে এমন ভাষা, চিহ্ন কিংবা ছবির ব্যবহারের মাধ্যমে একটি সংস্কৃতিভুক্ত সদস্যদের মাঝে অর্থের উৎপত্তি ও আদান-প্রদান হয় (হল, ১৯৯৭) ।

কোনো ঘটনা বা পরিস্থিতিকে অডিয়েন্স কীভাবে বিচার করবে বা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হবে, তার ওপর গণমাধ্যমের শক্তিশালী প্রভাব বিদ্যমান। ঘটে যাওয়া ঘটনা সম্পর্কে অডিয়েন্সকে অবহিত করার মধ্যেই কেবল গণমাধ্যমের ভূমিকা সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং ঘটনাগুলোকে বিশেষভাবে উপস্থাপন বা রিপ্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে গণমাধ্যম অডিয়েন্সের চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করে।

ভাষার মাধ্যমে অর্থের রেপ্রিজেন্টেশন কীভাবে হয়, তা তিনটি অ্যাপ্রোচের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়: প্রতিফলনকারী (Reflective), স্বেচ্ছাকৃত (Intentional) এবং নির্মাণমূলক (Constructionist) (হল, ১৯৯৭ [২০১৫])। এই গবেষণায় রিপ্রেজেন্টেশনের নির্মাণমূলক অ্যাপ্রোচ ব্যবহার করে চলচ্চিত্রের চরিত্রগুলোর সংলাপ, ভাষার ব্যবহার, অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে এর মাধ্যমে মধ্যবিত্ত জীবনের উপস্থাপন বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সেমিওটিক্স তত্ত্ব

চলচ্চিত্র থেকে তথ্য বিশ্লেষণের জন্য সুইস ভাষাবিজ্ঞানী ফার্দিনঁ দ্য সস্যুর[৩] ভাষাকে বৈজ্ঞানিকভাবে অধ্যয়নের উপায় উদ্ভাবন করেন। এটিকে বলা হয় সেমিওটিক্স। সেমিওটিক্স হলো কেবল মৌখিক ও লিখিত ভাষার ওপর নির্ভর না করে বিভিন্ন সংকেত বা চিহ্নকে অধ্যয়ন করা। সস্যুরের মতে, ভাষা হলো একটি চিহ্ন পদ্ধতি, আর চিহ্ন গঠিত হয় দুটি উপাদান দিয়ে- দ্যোতক (Signifier) ও দ্যোতিত (Signified)। দ্যোতক হলো সংশ্লিষ্ট বস্তুটি, আর দ্যোতিত হলো সংশ্লিষ্ট ধারণা (হল, ১৯৯৭ [২০১৫])।

---

[১] Stuart Hall (Feb. 3, 1932- Feb. 10, 2014)

[২] Roland Barthes (Nov. 12, 1915- March 26, 1980).

[৩] Ferdinand de Saussure (Nov. 26, 1857- Feb. 22, 1913).

গবেষণার ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রের সংকেত উদঘাটনের অর্থ হলো চলচ্চিত্রের কাহিনী-দৃশ্য-চরিত্রের অর্থ অন্বেষণ করা। অর্থ ব্যক্তি, বস্তু বা শব্দের মধ্যে থাকে না, বরং অডিয়েন্সই এর অর্থ দিয়ে থাকে এবং সেটি এমন এক শক্ত ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে দেয়া হয় যে একসময় তা স্বাভাবিক বলে মনে হয় (হল, ১৯৯৭ [২০১৫])। চলচ্চিত্রে সবসময় নির্দেশিত অর্থ (Denotative Meaning) বিশ্লেষণ করা হয় না, বরং কাঙ্ক্ষিত ফল অর্জনে প্রায়শই গূঢ়ার্থ (Connotative Meaning) বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। যেহেতু এই গবেষণায় চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত সংলাপ ও দৃশ্যায়নের বিশ্লেষণ করা হবে, তাই এই গবেষণায় ভিজ্যুয়ালের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের জন্য সেমিওটিক্স তত্ত্বের ব্যবহার করা হয়েছে।

নমুনায়ন

গবেষণাটিতে নমুনায়নের জন্য উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন (Purposive Sampling) পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করে উদ্দেশ্যমূলকভাবে গবেষণার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় নমুনা সংগ্রহ করাকে বলা হয় উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন (আলাউদ্দিন, ২০০৯)। সহজভাবে বলা যায়, উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন পদ্ধতি হলো এমন একটি নমুনায়ন পদ্ধতি, যেখানে গবেষক তার কাজের সুবিধা অনুযায়ী উদ্দেশ্যমূলকভাবে গোটা সমগ্রক থেকে নির্দিষ্ট কিছু নমুনাকে বেছে নেয় (Singh, 2006)। এই গবেষণায় নমুনা হিসেবে মৃণাল সেনের তিনটি চলচ্চিত্র 'ইন্টারভিউ' (১৯৭০), 'একদিন প্রতিদিন' (১৯৮০) ও 'খারিজ' (১৯৮২)- কে বাছাই করা হয়েছে। মৃণাল সেনের যে চলচ্চিত্রগুলো সবচেয়ে বেশি বিখ্যাত ও প্রশংসিত হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে এই তিনটি অন্যতম। এছাড়া শেষোক্ত দুটি চলচ্চিত্রে মধ্যবিত্ত জীবনের বিশেষ উপস্থাপনার জন্য যথাক্রমে ১৯৮০ ও ১৯৮৩ সালে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারও পেয়েছিলেন মৃণাল। যে কারণে এই তিনটি চলচ্চিত্রকে বিশ্লেষণ করা আমাদের কাছে যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণাটি সম্পন্ন করার জন্য ভিজ্যুয়াল অ্যানালাইসিস পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। ভিজ্যুয়াল অ্যানালাইসিসের অন্যতম পদ্ধতি সেমিওটিক্সের মাধ্যমে নমুনা হিসেবে বাছাইকৃত তিনটি চলচ্চিত্রের আধেয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

রোলাঁ বার্থের সেমিওটিক্স ভিজ্যুয়াল অ্যানালাইসিসের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃত। সেমিওলজির মাধ্যমে ছবি, ইমেজ, শব্দ ইত্যাদিকে দ্যোতক (Signifier) থেকে দ্যোতিত (Signified) হিসেবে বিশ্লেষণ করে প্রকৃত অর্থ বের করা হয়। সেখানে নির্দেশিত অর্থ (Denotative Meaning) থেকে সংকেত উদঘাটনের মাধ্যমে গূঢ়ার্থ (Connotative Meaning) বের করা হয় (হক, ২০১০)। এই গবেষণাতেও সেমিওলজির মাধ্যমে চলচ্চিত্রগুলোর বিভিন্ন ইমেজ ও সংলাপগুলো গভীরভাবে পাঠ করে অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অন্বেষণ করা হয়েছে।

তথ্য উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ

গবেষণার এই পর্যায়ে এসে মৃণাল সেন-পরিচালিত বাছাইকৃত তিনটি চলচ্চিত্র আধেয় বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাবলি উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ইন্টারভিউ (১৯৭০)

(বাংলা/ সাদা কালো), কাহিনি: আশীষ বর্মন; চিত্রনাট্য: মৃণাল সেন

১৯৫০-এর দশক থেকেই কলকাতায় রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিতে শুরু করে। ১৯৫৩ সালে পশ্চিমবঙ্গে ঘটে যাওয়া খাদ্য সংকট তৎকালীন কংগ্রেস সরকার সামাল দিতে না পারায় নিয়মিত গণবিক্ষোভ হতে থাকে। ১৯৬৬ সালে আরেকটি খাদ্য আন্দোলনকে কেন্দ্র করে আরও একবার অশান্ত হয়ে ওঠে পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক অঙ্গন। পুলিশের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের দফায় দফায় সংঘর্ষ, সাধারণ মানুষের ওপর পুলিশের গুলি চালানো যেন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এমন উত্তাল রাজনৈতিক পরিবেশেই ১৯৬৭ সালে শুরু হয় নকশাল আন্দোলন[৪]। নিজ শহরের এমন বেসামাল রাজনৈতিক পরিবেশে একজন সচেতন চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসেবে চুপ করে থাকতে পারেননি মৃণাল সেন। অবিরত প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের মধ্যেও কলকাতার অনেক তরুণের পুঁজিবাদী ধ্যান-ধারণা ও নিঃস্পৃহ মনোভাবের সমালোচনা করে মৃণাল সেন নির্মাণ করেন 'ইন্টারভিউ' (জুনাইদ, ২০১৪)।

১৯৭০ সালে আশীষ বর্মণের কাহিনি ও মৃণাল সেন প্রোডাকশনের ব্যানারে ১ ঘণ্টা ৪১ মিনিটের এই চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করেন মৃণাল সেন। ছবিটির কেন্দ্রীয় চরিত্র 'রঞ্জিত'-এ অভিনয় করেন রঞ্জিত মল্লিক। সাদাকালো এই চলচ্চিত্রটি ঝাঁঝালো বক্তব্য ও অভিনব নির্মাণশৈলির কারণে শ্রীলঙ্কা ফিল্ম ফেস্টিভালে 'ক্রিটিকস অ্যাওয়ার্ড' লাভ করে (রিবেরু, ২০১৮)।

প্রতিবাদী বক্তব্য উপস্থাপনের পাশাপাশি মৃণাল সেন প্রথমবারের মতো ভারতীয় সিনেমায় ব্যবহার করেন ব্রেখটীয় চলচ্চিত্রের নানা উপাদান। জার্মান নাট্যকার ও কবি বের্টোল্ট ব্রেখ্‌ট[৫] গতানুগতিক থিয়েটার প্রদর্শনীর ধারার বাইরে গিয়ে সম্পূর্ণ নতুন একটি ধারণা প্রদান করেন। গতানুগতিক থিয়েটারে দর্শককে আনন্দ দেওয়া হয়, কিন্তু দর্শক থিয়েটার থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে যান, যে কারণে দর্শকদের সামনে একটি বিভ্রম তৈরি হয়। ব্রেখ্‌ট দর্শক ও মঞ্চের মধ্যকার এই দূরত্ব ভেঙে দিতে চাইলেন। থিয়েটারের কল্পিত জগতের বিভ্রমে মগ্ন হয়ে দর্শকদের নিষ্ক্রিয় তৃপ্তিলাভের বদলে ব্রেখ্‌ট প্রতি মুহূর্তে দর্শকদের মননে ধাক্কা দিতে চাইলেন। ব্রেখ্‌টীয় চলচ্চিত্রে তাই দর্শকদের নিবিড় কল্পনায় হারিয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই, বরং দর্শককে প্রতিনিয়ত তার সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন করা হয় (জুনাইদ, ২০১৪)।

মৃণাল সেনও ঠিক একই কৌশল ব্যবহার করেছেন তাঁর 'ইন্টারভিউ' সিনেমার ক্ষেত্রে। দর্শকের ভেতরের প্রতিবাদী সত্তা জাগিয়ে তোলার কাজটি করেছেন এক মধ্যবিত্ত পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম যুবক রঞ্জিত মল্লিকের চরিত্রের মধ্য দিয়ে।

ছবির শুরুর ভাগে দেখা যায়, সকাল বেলা আয়েশ করে ঘুম থেকে উঠছে রঞ্জিত। চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে মাকে আরও একবার মনে করিয়ে দেয়, আজ তার সেই চাকরির ইন্টারভিউ, যেটি পেয়ে গেলে তার জীবন বদলে যাবে, বর্তমান চাকরির দ্বিগুণেরও বেশি বেতন পাবে। পরিচিত

---

[৪] ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলার নকশালবাড়ি অঞ্চলের এক অংশীদারী কৃষক জমির মালিকের অত্যাচারে নিহত হলে সারা গ্রামের কৃষকেরা একত্র হয়ে জমিদারদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শুরু করে। পরবর্তীকালে সেই বিক্ষোভের আঁচ কলকাতাসহ আরও অনেক জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। এই আন্দোলন পরে 'নকশালবাড়ি আন্দোলন' নামে পরিচিতি লাভ করে। চারু মজুমদার, কানু সান্যাল, জঙ্গল সাঁওতাল প্রমুখ এই আন্দোলনে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেন।

[৫] Bertold Brecht (Feb. 10, 1898- August 14, 1956).

শেখর কাকার সাহায্যে এক স্কটিশ কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ এসেছে তার সামনে। এই চাকরির ইন্টারভিউয়ের জন্য সাহেবি পোশাক পরাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে এই চলচ্চিত্রটি।

ছবিটিতে রাজনৈতিক ও বিপ্লবী আন্দোলনে মধ্যবিত্ত পরিবারের নিঃস্পৃহ মনোভাব যেমন দেখানো হয়েছে, তেমনি মধ্যবিত্ত সংসারের নিত্যদিনের টানাপোড়েনও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। শুরুর দিকে দেখা যায়, রঞ্জিতের মা ছেলের জন্য চা-বিস্কুটের ব্যবস্থা করছেন। রঞ্জিতের দিদি এসে তখন বলে, 'মা, সকাল থেকে তোমার ঠাকুরকে আজ ক'বার ডাকলে?' মায়ের জবাব আসে, 'আজ যেন নতুন করে ডাকতে হচ্ছে? এখন ভালোয় ভালোয় হলে বাঁচি'। পিতৃহীন মধ্যবিত্ত পরিবারের ভরণ-পোষণের সমস্ত দায়িত্ব যে সমর্থ ছেলেকেই নিতে হয়, ছেলের একটি ভালো চাকরি পেয়ে যাওয়া মানেই পরিবারের বাকি সদস্যদের চিন্তামুক্তি ঘটে, সেটিই যেন প্রকাশিত হয়েছে এখানে। রঞ্জিত যখন বারবার মাইনের কথা মনে করিয়ে দিতে চায়, তখনও মায়ের কণ্ঠে ফুটে ওঠে স্বভাবসূচক দুশ্চিন্তা, 'অত বারবার বলিস না, ভয় করে। শেষে যদি গোলমাল হয়'? রঞ্জিতের একটি ভালো চাকরিই যে তখন পুরো পরিবারের আরাধ্য বিষয়, সেটি বুঝতে আর বাকি থাকে না।

গোটা কলকাতা যখন বিক্ষোভে ফুঁসছে, রঞ্জিত তখন দিদির সাথে আরাধ্য চাকরির স্বপ্নে মশগুল। ছবিঃ সংগৃহীত।

ছবিতে রঞ্জিতকে আগাগোড়াই দেখা যায় বাঙালি পোশাক ধুতি-পাঞ্জাবিতে। বিদেশি কোম্পানিতে ইন্টারভিউ দিতে যাওয়ার মতো পশ্চিমা পোশাক তার নেই। এক জোড়া জীর্ণশীর্ণ জুতো ছাড়া কিছুই নেই তার। যে কারণে বাবার বহু পুরোনো প্যান্ট খুঁজে বেড়ায়, বন্ধু দিলীপের কাছ থেকে টাই ধার করে আনে, পাড়ার আরেক বন্ধুর কাছ থেকে বিকল্প হিসেবে এক জোড়া মোজাও ধার করে আনে। স্যুট ধার করার জন্য যেতে হয় আরেক ধনী বন্ধুর বাড়ি। মধ্যবিত্ত পরিবারের পোশাক-সংস্কৃতি ও আর্থিক দৈন্যদশাকেই যেন আরও একবার তুলে ধরতে চেয়েছেন চলচ্চিত্রকার।

বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারের একটি সাধারণ দৃশ্য হলো, উপার্জনক্ষম ব্যক্তির উগ্র মেজাজের চোটে তটস্থ থাকতে হয় পরিবারের বাকি সদস্যদের। মধ্যবিত্ত পরিবারের এই বাস্তবতাকে

চলচ্চিত্রকার তুলে এনেছেন রঞ্জিতের মধ্য দিয়ে। কাঙ্ক্ষিত চাকরি নিশ্চিত হওয়ার আগেই মা-বোনের সাথে তার দুর্ব্যবহার শুরু হয়ে যায়। ভাবখানা এমন যেন সকলের মালিক হয়ে উঠেছে সে। সেদিকে ইঙ্গিত করেই রঞ্জিতের দিদি বলে ওঠে, 'মা, তোমার ছেলের মেজাজ দেখলে? চাকরি না পেয়েই.....'।

মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের যাতায়াত ব্যবস্থাকেও চলচ্চিত্রকার ফুটিয়ে তুলেছেন এই ছবিতে। ছবিতে বেশিরভাগ সময়েই রঞ্জিতকে পায়ে হেঁটে চলাচল করতে দেখা যায়, আর দুয়েকবার ভিড়ে ঠাসা ট্রামে। বড়লোকদের মতো যখন তখন ট্যাক্সিতে চড়ার সামর্থ্য তার নেই, কোনো মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেরই থাকে না। গণপরিবহনেও যেতে হয় গাদাগাদি করে। স্বাচ্ছন্দ্য নয়, বরং সামর্থ্যই হয়ে ওঠে তাদের প্রধান চিন্তার বিষয়।

শেখর কাকার সাহায্যে রঞ্জিতের চাকরির ব্যবস্থা করার ঘটনার মধ্য দিয়ে মৃণাল সেন যেন আরও একটি বার্তা দিতে চেয়েছেন। মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেদের যোগ্যতার মাধ্যমে চাকরি পাওয়া যে কতটা কঠিন, সেটাই যেন স্পষ্ট করতে চেয়েছেন চলচ্চিত্রকার। যোগ্যতার চেয়ে বড় হয়ে ওঠে স্বজনপ্রীতি ও বাইরের চাকচিক্য। শেখর কাকা যখন বারবার রঞ্জিতকে সাহেবি পোশাক পরে আসার কথা মনে করিয়ে দেয়, তখন রঞ্জিত বলে ওঠে, 'আর কিছু লাগবে না?'। এ থেকেই যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে, ঘুণে ধরা এই সমাজে যোগ্যতার চেয়ে স্বজনপ্রীতি ও বাইরের চাকচিক্যই বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

রঞ্জিত ও তার প্রেমিকার বিয়ে পরবর্তী জীবন নিয়ে ফ্যান্টাসি দৃশ্যের মধ্য দিয়ে চলচ্চিত্রকার মধ্যবিত্ত শ্রেণির সমাজ বাস্তবতা থেকে নিজেদের সরিয়ে নেওয়ার মানসিকতার প্রতি তীব্র ধিক্কার জানিয়েছেন। একই সময়ে কলকাতা শহরে যুব সমাজের আন্দোলন চলছে, অথচ সেদিকে যেন কোনো ভ্রূক্ষেপই নেই রঞ্জিতের। বিয়ের পর ফ্ল্যাট কিনবে, ঘর সাজাবে এই স্বপ্নেই মশগুল সে। উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিবেশের আঁচ তাকে একটুও স্পর্শ করছে না; নিজের দামি চাকরি ও বিয়ে সংক্রান্ত ফ্যান্টাসি নিয়েই দিব্যি আছে সে। রঞ্জিতের এই পুঁজিবাদী ও ভোগবাদী মানসিকতার মধ্য দিয়ে চলচ্চিত্রকার মৃণাল সেন যেন গোটা মধ্যবিত্ত সমাজের পুঁজিবাদী ধ্যান-ধারণার ওপরেই আঘাত হানার চেষ্টা করেছেন। রাজনীতি-বিমুখতা ও অসচেতনতা, পুঁজিবাদের জোয়ারে গা ভাসিয়ে দেয়ার মানসিকতা, প্রতিবাদী সত্তার অনুপস্থিতি মধ্যবিত্ত সমাজের এই বৈশিষ্ট্যগুলোই মৃণাল সেন তুলে ধরতে চেয়েছেন রঞ্জিত চরিত্রটির মধ্য দিয়ে। পর্দায় ফুটে ওঠা ম্যানিকুইন যেন পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থার সাথে প্রতিবাদহীনভাবে এগিয়ে চলতে চাওয়া মধ্যবিত্ত মানুষেরই প্রতীক। চলচ্চিত্রকার দেখাতে চেয়েছেন, কলকাতার অনেক আদর্শবাদী তরুণ যেখানে নকশাল আন্দোলনের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করেছে, সেখানে রঞ্জিতের মতো ভোগবাদী মানসিকতার তরুণেরা নিজেদের সেই আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে, ঔপনিবেশিক কাঠামোর মধ্যে নিজেদের শৃঙ্খলিত করে রেখেছে। তথাকথিত শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও তাদের মানসিক মুক্তিলাভ ঘটেনি, বিপ্লবী চেতনায় নিজেদের উদ্বুদ্ধ করতে শেখেনি তারা। শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের বদলে শোষণমূলক সমাজ-ব্যবস্থাকেই তারা নিরাপদ আশ্রয়স্থল বানাতে চায়। নির্মম এই বাস্তবতাগুলোই মৃণাল সেন তাঁর 'ইন্টারভিউ' সিনেমায় দক্ষতার সাথে তুলে ধরেছেন।

একদিন প্রতিদিন (১৯৮০)

(বাংলা/ রঙিন), কাহিনিঃ অমলেন্দু চক্রবর্ত্তী; চিত্রনাট্যঃ মৃণাল সেন

মৃণাল সেন তাঁর যে কয়টি চলচ্চিত্রের মাধ্যমে মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের জীবনযাত্রার উপস্থাপন দেখিয়েছেন, 'একদিন প্রতিদিন' সেগুলোর মধ্যে অন্যতম। নিজের প্রথম আন্তর্জাতিক পরিচিতিপ্রাপ্ত সিনেমা 'বাইশে শ্রাবণ'- এর ঠিক এক যুগ পর নির্মাণশৈলিতে বদল এনে এই চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করেন তিনি। এক বন্ধুর পরামর্শে অমলেন্দু চক্রবর্ত্তীর 'অবিরত চেনামুখ' নামে একটি ছোটগল্প অবলম্বনে তিনি এই ছবিটি তৈরি করেন।

১৯৮০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত এই চলচ্চিত্রটির প্রধান প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন মমতা শঙ্কর, শ্রীলা মজুমদার, গীতা সেন, সত্য ব্যানার্জী প্রমুখ। মুক্তির বছরেই ছবিটি তিনটি ক্যাটাগরিতে জাতীয় পুরস্কার লাভ করে (সেরা বাংলা চলচ্চিত্র, সেরা পরিচালক, সেরা সম্পাদনা)। ১৯৮০-র কান ফিল্ম উৎসবেও প্রদর্শিত হয় ছবিটি।

ছবিটির কাহিনি আবর্তিত হয় সাত সদস্যবিশিষ্ট একটি পরিবারকে ঘিরে, যার কর্তা হৃষীকেশ সেনগুপ্ত। তিন বছর আগে তিনি চাকরি থেকে অবসর নেয়ার পর থেকে তার বড় মেয়ে চিন্ময়ী (ডাকনাম 'চিনু') সংসারের সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। সংসার খরচ থেকে শুরু করে মেজো বোনের কলেজে পড়ালেখার খরচ, বেকার ভাইয়ের দায়িত্ব সবই একা হাতে পালন করে চিনু। মধ্যবিত্ত সেনগুপ্ত পরিবারের বাধ্যগত মেয়ে সে, পরিবার থেকে প্রতিবেশী সকলেই চিনুকে ভালো মেয়ে হিসেবে জানে। কিন্তু এক রাতে অফিস থেকে বাসায় ফিরতে না পারায় চিনু সম্পর্কে সবার এতদিনের সব ধারণা নিমিষেই পাল্টে যায়। ঠিক কী কারণে বাড়ি ফিরতে পারেনি চিনু, সেটা না জেনেই যে যার মতো মন্তব্য করতে শুরু করে দেয়। এমনকি চিনুর চরিত্র সম্পর্কেও প্রশ্ন তুলতে ছাড়ে না। মধ্যবিত্ত পরিবারের একজন অবিবাহিত কর্মজীবী নারী ও তার পরিবারের এই টানাপোড়েন নিয়েই 'একদিন প্রতিদিন' এর গল্প।

সাধারণত সন্ধ্যা ছয়টার মধ্যে চিনু বাড়ি ফিরে এলেও সেদিন রাতে বাড়ি না ফেরায় চিনুর বাবা-মায়ের যতটা না মেয়েকে নিয়ে দুশ্চিন্তা হচ্ছিল, তার চেয়েও বেশি চিন্তা হচ্ছিল প্রতিবেশীরা চিনুর রাতে বাড়ি না ফেরার খবর জানতে পারলে কী হবে সেই বিষয়ে। মেয়ের নিরাপত্তা নয়, বরং লোকলজ্জার ভয়ে কুঁকড়ে থাকে তারা। মেয়ে বাড়ি ফেরেনি, একেবারে নিরুপায় না হওয়া পর্যন্ত এ কথা কাউকে জানাতে চায়নি চিনুর পরিবার, কারণ এটি তাদের কাছে লজ্জার বিষয়। চিনুর অফিসে খোঁজ নেওয়ার জন্য ডিসপেনসারি থেকে বোন মিনু ফোন করতে গেলে ডিসপেনসারির লোক যখন চিনুর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে, তখন সেও আসল কথাটা বলতে পারে না, ওভারটাইমের কথা বলে নিজেদের 'লজ্জা' নিবারণ করে। মেয়ের অপেক্ষায় বাবা যখন ট্রামলাইনের ধারে দাঁড়িয়ে থাকে, তখনও প্রতিবেশী শ্যামল বাবুর কাছে মেয়ের বাড়ি না ফেরার কথাটি গোপন করে যান তিনি, পাছে প্রতিবেশীর কাছে তাদের মান-সম্মান ক্ষুণ্ন হয়। মধ্যবিত্ত পরিবারের এই মানসিকতাকে যেন চলচ্চিত্রকার ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন প্রতিবেশী শ্যামল বাবুর মুখ দিয়ে, 'আমাদের যদি এরকম হতো, তাহলে আমরাও বোধহয় কাউকে কিছু বলতাম না। এ আমাদের লজ্জা'।

একটি অবিবাহিত মেয়ের রাতে বাড়ি না ফেরাকে মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষ কোন দৃষ্টিতে দেখে, ছবির সংলাপের মধ্য দিয়ে চলচ্চিত্রকার মৃণাল সেন তা দুর্দান্তভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। একদিকে মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে সারা রাত বাড়ি না ফিরলে বাবা-মায়ের দুশ্চিন্তাকে যেমন দেখিয়েছেন তিনি, অপরদিকে লোকলজ্জা ও মান-সম্মান খোয়ানোর ভয় কীভাবে তাদের গ্রাস করে, সেটিও সুনিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন চিনুর বাবা হৃষিকেশ বাবুর মুখ দিয়ে, 'এ বাড়ির এতগুলো লোক, সবাই একে একে জেনে গেলো যে আমাদের মেয়েটা এখনও বাড়ি ফিরল না'। সংলাপটি থেকে স্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান, মেয়ের কোনো বিপদ হলো কি না, তা নিয়ে বাবার মনে শঙ্কা জাগছে না, বরং আশেপাশের মানুষ মেয়ে রাতে বাড়ি না ফেরায় কটু কথা বলবে, সে চিন্তাতেই বিভোর তিনি। হৃষীকেশ যেন এখানে কেবল চিনুর বাবা নন, বরং সমাজের প্রতিটি মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ের বাবার প্রতিচ্ছবি। মেয়ের নিরাপত্তার চিন্তা যেন তাদের কাছে গৌণ; সমাজে মুখ দেখাতে পারাটাই হয়ে ওঠে মুখ্য বিষয়।

যে মেয়ের উপার্জনের টাকায় সংসার চলে, এক রাত বাড়ি ফিরতে না পারায় সেই মেয়েই যেন পরিবারের কাছে পরিণত হয় ঝামেলায়। দিদি বাড়ি না ফেরায় মেজো বোন মিনু যখন বলে 'দিদিটা আজ এভাবে ফেঁসে গেলো', তাদের মা তখন উত্তর দেয়, 'আমাদেরও ফাঁসিয়ে গেলো'। এ সংলাপ থেকেই পরিষ্কার, মেয়ের নিরাপত্তার বিষয়টি তার মাথায় আসছে না, বরং সমাজে তাদের কেমন বিরূপ পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে, অনেকের অনেক রকম প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে, এসব চিন্তাই তার কাছে মুখ্য হয়ে ওঠে। যে কারণে চিনুর বাড়ি না ফেরাতে তারা নিজেদের জন্য ঝামেলা মনে করে।

প্রতিবেশীদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়ে মৃণাল সেন যেন সমাজের বৃহত্তর মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানসিকতাকেই তুলে ধরতে চেয়েছেন। মেয়ে রাতে বাড়ি না ফেরায় একটি পরিবার যখন আতঙ্কের মধ্যে থাকে, তখন প্রতিবেশীর বিপদে কিছু প্রতিবেশী এগিয়ে আসে বটে, যেমনটা এসেছেন শ্যামল বাবু ও চিনুর ছোট ভাই তপুর বন্ধু অমল, কিন্তু আশেপাশের বেশিরভাগ মানুষই স্রেফ মিথ্যা সহানুভূতি দেখায়, আর পেছনে হাজারটা কটু বলে। ছবিতে চলচ্চিত্রকার তেমনটাই তুলে ধরেছেন চিনুদের ভবনেরই আরেক বৃদ্ধ প্রতিবেশীর মুখ দিয়ে, 'এই মেয়ে নির্ঘাত কারোর সাথে পালিয়ে গেছে। অফিস-কাচারি করা মেয়েদের কোনো বিশ্বাস নেই। মেয়েরা মেয়েদের মতো না চললে ওরকমই হয়'। অবিবাহিত একজন মেয়ে চাকরি করে পুরো সংসারের দায়িত্ব পালন করছে, সেটাও যেন তার অপরাধ! কর্মজীবী নারীদের সম্পর্কে সাধারণ মধ্যবিত্ত সমাজের ধারণাটাই যেন এ সংলাপের মাধ্যমে চলচ্চিত্রকার পরিষ্কার করে দিলেন। কোনো কিছু নিশ্চিতভাবে না জেনে কেবল অনুমানের ভিত্তিতে একটি মেয়ের চরিত্র সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতেও তাদের বিবেকে বাঁধে না। মেয়েদের অফিস-কাচারিতে কাজ করতে যাওয়া নিয়ে তাদের প্রবল আপত্তি, কিন্তু একা একটি মেয়েকে যে পুরো পরিবারের ভার সামলাতে হয়, সে ব্যাপারে তাদের বিন্দুমাত্র সহানুভূতি থাকে না। তাই তো ওই বৃদ্ধ প্রতিবেশীর ছোট নাতনি যখন জিজ্ঞেস করে, 'আর মেয়েদের যখন ছেলেদের মতো কাজ করতে হয়?', তখন বৃদ্ধ দাদু ধমক দিয়ে তাকে চুপ করাতে চায়, কারণ এই প্রশ্নের কোনো উত্তর তার কাছে নেই। এই দৃশ্যের মধ্য দিয়ে মৃণাল সেন যেন যৌক্তিক প্রশ্নে বৃহত্তর মধ্যবিত্ত শ্রেণির নিশ্চুপ ও নিরুত্তর থাকার প্রবণতাকেই বোঝাতে চেয়েছেন।

নিজের পরিবারের সদস্যদেরই যেন অপরিচিত লাগছে চিনুর। ছবি: সংগৃহীত।

অবিবাহিত মেয়ে রাতে বাড়ি না ফিরলে তার পরিবারকে সমাজে কী ধরনের পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়, তার কিছুটা দৃশ্যায়ন যেন দেখা যায় ছবিটির শেষভাগে এসে, যখন বাড়ির মালিক হৃষীকেশ বাবুকে বাড়িটা ছেড়ে দিতে বলেন। কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'এটা ভদ্রলোকের বাড়ি, ভদ্রলোকের পাড়া। এসব বেচাল এখানে চলবে না'। চিনু রাতে বাড়ি না ফেরায় পরোক্ষভাবে যেন চিনুর গোটা পরিবারকেই তিনি অভদ্র বলে সম্বোধন করতে চাইলেন। এই দৃশ্য আমাদের সমাজের কর্মজীবী নারীদের ক্ষেত্রেও বিরল নয়। রাতের শিফটে কাজ করা নারীকে কিংবা রাত করে বাড়ি ফেরা নারীকে প্রায়ই এমন হেনস্তার শিকার হতে হয়। বাড়ির মালিক তো বটেই, সুযোগ পেলে দারোয়ান থেকে পাড়া-পড়শিরাও কথা শোনাতে ছাড়ে না।

চারপাশের মানুষজনের এরকম বিরূপ আচরণ প্রভাব ফেলে চিনুর পরিবারের সদস্যদের ওপরেও। হঠাৎ করে চিনু বাড়ি ফিরে আসার পরেও যেন স্বস্তিভাবের বদলে একপ্রকার বিরক্তিই ফুটে ওঠে তার মায়ের কণ্ঠে, 'বাইরে দাঁড়িয়ে আর লোক হাসাতে হবে না'। সংলাপটি থেকে চিনুর প্রতি বিরক্তিভাবই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সারা রাত বাড়ি না ফেরায় চিনুর জন্য সবাইকে যে 'ভোগান্তি' পোহাতে হয়েছে, সেটি পরিষ্কার করতেই যেন চিনুকে নীরবতার মধ্য দিয়ে বরণ করে নেয়া হয়। বাবা-মা তো কথা বলেইনি, এমনকি সারা রাত যে ব্যক্তিটি চিনুর হয়ে লড়াই করে গেছে, সেই বোন মিনুও যেন এবার নিশ্চুপ হয়ে যায়। চিনু কোথায় আটকে পড়েছিল, কেন তার আসতে দেরি হলো, এ কথা শোনার প্রয়োজনীয়তাটুকুও বোধ করেনি কেউ। চিনু বুঝতে পারে, মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে তার সাথে পরিবারের সদস্যদের দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে গেছে। চিনুর মনে হয়, সে যেন বাড়ি ফিরে ভুল করে ফেলেছে। তাই যে পরিবারের জন্য তার এত লড়াই, বাধ্য হয়ে সেই পরিবারের উদ্দেশ্যেই এক বুক আক্ষেপ নিয়ে সে বলে, 'মাত্র এই কয় ঘণ্টার মধ্যে আমি তোদের কাছে কতটা পর হয়ে গেলাম। আজ যদি আমার কিছু হয়ে যেত, তাহলে হয়তো তোদের কিছু বলার থাকত'। দারুণ শক্তিশালী ও তাৎপর্যপূর্ণ এই সংলাপের মধ্য দিয়ে মৃণাল সেন যেন মধ্যবিত্ত শ্রেণির বোবা মানসিকতার গায়েই নির্মম চপেটাঘাত করতে চেয়েছেন।

ছবিটিতে চলচ্চিত্রকার মধ্যবিত্ত সমাজের পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতাও দেখাতে চেয়েছেন। চিনুর ছোট ভাই তপু যথেষ্ট বড় হওয়া সত্ত্বেও সংসারে কোনো অবদান রাখে না। সারা দিন বাইরে ঘুরে বেড়ায়, ইচ্ছে হলে মাঝরাতে বাড়ি ফেরে। তবুও সমাজের কারোর চোখে সে খারাপ না। আর যে মেয়েটি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কষ্ট করে সংসারের জন্য উপার্জন করছে, তার এক রাত বাড়ি ফিরতে দেরি হয়েছে বলে সমাজের মানুষ তার চরিত্র নিয়ে কথা বলতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। আমাদের সমাজে বেশিরভাগ কর্মজীবী নারী যে ন্যূনতম সম্মানটুকুও পান না, সেটিই যেন মৃণাল সেন দেখাতে চেয়েছেন 'একদিন প্রতিদিন' এর মধ্য দিয়ে।

মৃণাল সেনের দূরদর্শিতার প্রমাণ পাওয়া যায় আরও একটি দৃশ্যে। চিনুই যে একমাত্র নয়, আমাদের সমাজে এমন পরিণতি আরও অনেক মেয়েরই হতে পারে, সেটি আঁচ করতে পেরেই কি না মিনুর মুখ দিয়ে এই সংলাপগুলো বলিয়েছেন চলচ্চিত্রকার— 'আমি পড়াশোনা ছেড়ে দেব। চাকরি করব। তারপর একদিন রাত্তিরে, তোরা আমার জন্য এমনি করে বসে থাকবি। রাত জাগবি। থানা-পুলিশ-হাসপাতাল সব করবি। আমি আর ফিরব না। আমিও দিদির মতন...'। মৃণাল সেনের দূরদর্শিতা ভুল প্রমাণিত হয়নি। আজও আমাদের সমাজে অসংখ্য চিনুর অস্তিত্ব আছে, নিজ যোগ্যতায় সংসারের জন্য পরিশ্রম করেও যারা প্রাপ্য সম্মানটুকু পায় না। চিনু চরিত্রটির মধ্য দিয়ে মৃণাল সেন আমাদের সমাজের সেই কর্মজীবী নারীদের সংগ্রামময় জীবনকেই যেন তুলে ধরতে চেয়েছেন আমাদের সামনে।

খারিজ (১৯৮২)

(বাংলা/ রঙিন), কাহিনি: রমাপদ চৌধুরী; চিত্রনাট্য: মৃণাল সেন

রমাপদ চৌধুরীর কাহিনী অবলম্বনে ১৯৮২ সালে মৃণাল সেন নির্মাণ করেন 'খারিজ'। ছবিটির মূল চরিত্রে অভিনয় করেন অঞ্জন দত্ত, মমতাশঙ্কর, শ্রীলা মজুমদার প্রমুখ। মুক্তির পরপরই ব্যাপক প্রশংসিত ছবিটি ১৯৮৩ সালে চারটি ক্যাটাগরিতে জাতীয় পুরস্কার জিতে নেয় (দ্বিতীয় সেরা ছবি, সেরা বাংলা ছবি, সেরা সম্পাদনা, সেরা শিল্প নির্দেশনা)। একই বছর কান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে বিশেষ জুরি পুরস্কারও লাভ করে সিনেমাটি।

'খারিজ' চলচ্চিত্রে মৃণাল সেন অত্যন্ত স্পষ্টভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণির সমালোচনা করেছেন। নিজে মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ হওয়া সত্ত্বেও যৌক্তিক সমালোচনা করতে একটুও পিছপা হননি তিনি। ছবির শুরুতে তরুণ প্রেমিক-প্রেমিকা অঞ্জন ও মমতার কথোপকথন শুনতে পাওয়া যায়। অঞ্জন মমতাকে জিজ্ঞেস করে, বিয়ের পর তার ফ্ল্যাট-ফ্রিজ-গাড়ি-টেলিভিশন কী চাই। জবাবে মমতা আবেগপ্রবণ হয়ে জানায়, 'মশাই, আমার শুধু তোমাকেই চাই'।

এরপর কাট করে চলচ্চিত্রকার চলে আসেন বর্তমানে। বিয়ের পর তারা এখন এক সন্তানের জনক-জননী। এবারেও অঞ্জন মমতাকে জিজ্ঞেস করে তার কী লাগবে। কিন্তু এবার আর মমতা আবেগপ্রবণ উত্তর দেয় না, বরং অনেক বেশি বাস্তববাদী উত্তর দেয়। এবারে সে একটি বারো-তের বছরের কাজের ছেলে চায়, যে কি না তাদের ছেলে পুপাইকে দেখাশোনার পাশাপাশি কয়লা ভাঙবে, উনুন ধরাবে, চা করবে, বাসন মাজবে, সিগারেট-দেশলাই আনবে, রেশন আনবে, ধোপাবাড়ি যাবে বাড়ি সামলাবে ও অন্যান্য টুকিটাকি কাজকর্ম করবে।

এরপরের দৃশ্যে দেখা যায় বাবা-ছেলে হারান ও পালানকে। হালকা কিছু কথাবার্তা ও বেতন নিয়ে দর-কষাকষির পর ঠিক হয়, পালান এই বাড়িতে কাজ করবে। এই দৃশ্যে চলচ্চিত্রকার সংলাপগুলো এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন, যেন মমতা টেলিভিশন-ফ্রিজের মতো কোনো যন্ত্র কিনছে, যে কি না নির্দেশ দেয়া মাত্রই ঘরের সব কাজ করতে প্রস্তুত থাকবে। কাজের ছেলে ঠিক করার এই দৃশ্যের মধ্য দিয়ে চলচ্চিত্রকার যেন দর্শকদের সেই মধ্যযুগীয় দাস ব্যবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছেন, যেখানে দরদাম করে ভৃত্য কিনতেন প্রভুরা। এই দৃশ্যের মাধ্যমে চলচ্চিত্রকার মধ্যবিত্ত মানুষদের মধ্যে এক ধরনের বিবেকবোধ জাগ্রত করতে চেয়েছেন।

ছবিটি যতই এগিয়েছে, ততই যেন মৃণাল সেনের সমালোচনার ভাষা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে। পালানের প্রতি দায়িত্বহীনতার চূড়ান্ত পরিণতি তিনি দেখিয়েছেন পালানের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। তীব্র শৈত্যপ্রবাহ সত্ত্বেও পালানকে থাকতে দেয়া হয়েছে সিঁড়ির তলায়, উপরন্তু কোনো অতিরিক্ত কম্বলের ব্যবস্থাও করা হয়নি বাচ্চা ছেলেটির জন্য। কনকনে ঠান্ডার হাত থেকে বাঁচার জন্য নিরুপায় হয়ে বেচারা পালান রান্নাঘরে জ্বলন্ত উনুনের ধারে রাত কাটায়। পরবর্তী পর্যায়ে ওই বন্ধ রান্নাঘরে কার্বন মনোঅক্সাইডের বিষাক্ত থাবায় প্রাণ যায় ছেলেটির। পালানের প্রতি অঞ্জন-মমতার এই চূড়ান্ত অবজ্ঞা-অবহেলা যেন বৃহত্তর মধ্যবিত্ত সমাজে বিদ্যমান সমাজব্যবস্থাকেই ফুটিয়ে তোলে। অর্থনৈতিক দিক থেকে নিচু শ্রেণির মানুষদের প্রতি মধ্যবিত্ত শ্রেণির উপেক্ষা ও অবজ্ঞার তীব্র ভর্ৎসনা করেছেন মৃণাল সেন। 'খারিজ' শিশুশ্রমের ওপর ভিত্তি করে নির্মিত কোনো চলচ্চিত্র নয়, কিন্তু নিন্দনীয় এই অপরাধকে হাতিয়ার বানিয়েই মধ্যবিত্ত শ্রেণির তীব্র সমালোচনা করেছেন মৃণাল সেন।

পালানের প্রতি উদাসীনতার নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায় পালানের মৃত্যুর পরে, যখন দেখানো হয় পালানের পুরো নাম, এমনকি গ্রামের বাড়ির ঠিকানাটা পর্যন্ত জানে না অঞ্জন-মমতার কেউই। পাশের বাসার লোকেদের থেকে টাকা ধার করে পালানের নাইট শোতে সিনেমা দেখতে যাওয়ার ব্যাপারেও সম্পূর্ণ অজ্ঞ তারা। কাজের ছেলে দরকার ছিল, পেয়ে গেছি, এখন আর তার প্রতি কোনো দায়িত্ব নেই- মধ্যবিত্ত–শ্রেণির এই গা ছাড়া মানসিকতার সমালোচনা করতে চেয়েছেন মৃণাল সেন।

এদিকে পালানের মৃত্যুর পর পরিবারের কর্তা অঞ্জনের মধ্যে যতটা না অপরাধবোধ কাজ করে, তার চেয়ে বেশি কাজ করে ভয়। ঘটনাটিকে স্রেফ 'দুর্ঘটনা' বলে চালিয়ে দিয়ে নিজের ঘাড় থেকে দায় ঝেড়ে ফেলতে চায় সে। ডাক্তারের কাছে গিয়ে জানতে চায় পালানের অন্য কোনো অসুখ ছিল কি না, যার কারণে মৃত্যু হতে পারে। ব্যতিক্রম নয় মমতাও, অঞ্জনের মতো সেও নিজের দোষ এড়িয়ে যাওয়ার জন্য বিশ্বাস করতে চায়, 'হয়তো পালানের কোনো অসুখ ছিল, আমরা জানতে পারিনি!' ডাক্তার যখন জানায় এটি একটি পুলিশ কেস, তখন অঞ্জনের চোখে-মুখে স্পষ্ট ভয়ের ছাপ ফুটে ওঠে। এমনকি প্রতিবেশী শ্রীলার বাবার পরামর্শ অনুযায়ী আইনি পরামর্শ নিতে যেতেও ভয় পায় সে। রান্নাঘরে কেন ভেন্টিলেটর নেই, বাড়িওয়ালার প্রতি এই প্রশ্ন তুলে নিজেদের উদাসীনতার ব্যাপারকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টাও সে করেছে। আবার বাড়িওয়ালাও উল্টো অঞ্জনের ঘাড়ে দোষ চাপাতে চায় এই বলে, 'বাড়ি ভাড়া দিয়েছি, এরপর আমার আর কোনো দায়িত্ব নেই'। মূলত নিজের দোষ অন্যের ওপর চাপিয়ে দিয়ে বিপদ থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকতে চাওয়ার যে প্রবণতা মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে

দেখা যায়, সেটিকেই তুলে ধরতে চেয়েছেন চলচ্চিত্রকার। এমনকি দায় ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলার এতই তাড়া যে, পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করে যাওয়ার পরে অঞ্জন মমতাকে বলে, 'রাতে উনুন নেভানো হয়নি, এই কথাটা না বললেও চলত'।

পালানের মৃত্যুর পেছনে নিজেদের কোনো দায় নেই, উকিলকে সে বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টায় ব্যস্ত অঞ্জন। ছবি: সংগৃহীত।

তবে মৃণাল সেন দর্শকদের সবচেয়ে বড় ধাক্কাটা দিয়েছেন আইনজীবী ও অঞ্জনের মধ্যকার কথোপকথনের দৃশ্যে। আইনি সহায়তার জন্য শ্রীলার বাবা অঞ্জনকে তার এক পরিচিত নামী উকিলের কাছে নিয়ে যান। সমস্ত ঘটনা শোনার পর উকিলবাবু যে কথাগুলো বলেন, সেগুলোই যেন মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্দেশ্যে মৃণাল সেনের নিজস্ব বার্তা। নিজের দায় এড়িয়ে যাওয়ার জন্য অঞ্জন উকিলকে বলে, 'ও (পালান) তো আমাদের বাড়ির লোকের মতোই ছিল'। জবাবে উকিল বলেন, 'না না, ছিল না। থাকা সম্ভব না। আপনারা ওকে ভালোবাসতেন, ওইটুকুই। তার বেশি নয়। যতটা সুযোগ-সুবিধা আপনার ছেলে পেয়েছে, তার কতটুকু ও পেয়েছিল? ওকে শোবার ঘর দিয়েছেন? দেননি। ও তো শুতো সিঁড়ির তলায়। আচ্ছা, এই যে কলকাতার ওপর দিয়ে কদিন শৈত্যপ্রবাহ বয়ে গেলো, কখনো ভেবেছিলেন যে ওকে একটা বাড়তি কম্বল দিলে ভালো হয়? ভাবেননি, আমরা কেউই ভাবি না'। কথাগুলো দিয়ে যেন শুধু অঞ্জনকে নয়, বরং গোটা মধ্যবিত্ত সমাজকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন মৃণাল সেন। কথাগুলো শোনার পর অঞ্জনের নিশ্চুপ থাকার মধ্য দিয়ে চলচ্চিত্রকার বোঝাতে চেয়েছেন, যৌক্তিক এই কথাগুলোর কোনো উত্তর অঞ্জনের মতো মধ্যবিত্ত মানুষদের কাছে নেই। 'আইনি মিথ্যা সর্বদাই নৈতিক সত্যের সাথে লড়াইয়ে জয়লাভ করে', এরকম শক্তিশালী সংলাপ দিয়ে দর্শকদের মনে বোধোদয় জাগ্রত করার চেষ্টা করেছেন চলচ্চিত্রকার।

সবাই নিজেদের পিঠ বাঁচাতে এতই তৎপর যে একটি বাচ্চা ছেলে যে মারা গেছে, সেটি নিয়ে ভাবার মতো দুদণ্ড সময় কারোর হয় না। প্রতিবেশী শ্রীলার বাবা বরং পুরো ঘটনাটিকে 'কয়েকদিনের ঝামেলা' বলে মনে করেন। নিজেদের ছেলে পুপাইয়ের যত্নআত্তির কোনো অভাব হয় না, কিন্তু প্রায় সমবয়সী আরেকটি ছেলে পালানের বেলায় লক্ষ্য করা যায় চরম উদাসীনতা। প্রতিবেশী ও পালানের পরিবারের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া, আইনি ঝামেলা ইত্যাদি সবকিছু মিলিয়ে তরুণ এই দম্পতি ভীষণ

চাপে পড়ে যায়, এবং শেষ পর্যন্ত এত চাপ সহ্য করতে না পেরে কান্নায় ভেঙে পড়ে মমতা। কিন্তু আশ্চর্যজনক হলেও সত্য, স্বামী-স্ত্রী দুজনের কেউই একবারের জন্য হলেও একসাথে বসে ভাবার চেষ্টা করেনি, পালানের প্রতি তাদের কোথায় গাফিলতি ছিল। পালানের মৃত্যু নয়, বরং মৃত্যুর পরে তাদেরকে যেসব ঝামেলার মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে, সেগুলোই তাদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মূল কারণ। মধ্যবিত্ত শ্রেণির বাস্তবতাকে এড়িয়ে যাওয়ার এই প্রবণতাই যেন ফুটে ওঠে অঞ্জন ও মমতার আচরণের মধ্য দিয়ে।

পালানের জন্য মমতার চোখে এক ফোঁটা পানিও দেখতে পাওয়া যায়নি, বরং পালানের বাবাকে কী জবাব দেবে, সেই দুশ্চিন্তা সামলাতে না পেরে কেঁদে ফেলে মমতা। একটি বাচ্চা ছেলের জীবনের চেয়েও যেন তাদের 'ভদ্রলোক ইমেজ' ধরে রাখা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অঞ্জনও মমতাকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করে পুরো ঘটনাটিকেই স্রেফ একটি দুর্ঘটনা বলে চালিয়ে দেয় সাথে এ-ও বলে যে এখানে তাদের কিছুই করার ছিল না। অর্থাৎ পালানের মৃত্যুও পরেও নিজেদের দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা থেকে বের হতে পারেনি তারা।

ছেলের মৃত্যুসংবাদ পালানের বাবাকে জানানোর ব্যাপারেও অঞ্জনের মধ্যে নেতিবাচক মনোভাব দেখা যায়। পালানের বন্ধু হরি পালানের বাড়ি চিনলেও অঞ্জন তাকে পালানদের বাড়িতে পাঠায় না, কারণ সে হারানের মুখোমুখি হতে চায় না। এমনকি খবর না দেয়া সত্ত্বেও যখন হারান ছেলের মাসিক বেতন নেয়ার জন্য নির্ধারিত সময়ের দুই দিন আগেই চলে আসে, মমতাও প্রথমে হারানের মুখোমুখি হতে ভয় পায়। তাই হরিকে দিয়েই হারানের অভ্যর্থনা করে। হারান যেন বাইরে গিয়ে কোনো ঝামেলা পাকাতে না পারে, তাই অনেকটা জোর করেই তাকে রাতে ওই বাড়িতে থেকে যেতে বাধ্য করা হয়। পুরো সময় জুড়েই অঞ্জনের মধ্যে যে গা বাঁচানো স্বভাব দেখা গেছে, এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। হারানকে সান্ত্বনা দেয়ার সময়েও সে বোঝাতে চায়, পালানের মৃত্যুর পেছনে তাদের কোনো হাত নেই।

নিজেদের যেন আর কোনো বাড়তি ঝামেলায় পড়তে না হয়, সেজন্য শ্রীলার বাবা অঞ্জনকে পরামর্শ দেয় যেভাবেই হোক হারানকে লাশের সৎকার না হওয়া পর্যন্ত বাড়িতে আটকে রাখতে। কারণ বাইরে গেলে কে তাকে কী পরামর্শ দেবে, তা কেউ জানে না। এতে বরং ঝামেলা আরও বাড়তে পারে। নিজেদের পিঠ বাঁচাতে তারা এতই তৎপর, সদ্য ছেলে হারানোর সংবাদ পাওয়া এক বাবার মানসিক অবস্থা বোঝার ইচ্ছা বা সময় কোনোটাই তাদের নেই। নিজেরা ঝামেলা থেকে বাঁচার জন্য বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি যে অন্যের প্রতি অসংবেদনশীল আচরণ করতেও পিছপা হয় না, সেটিই যেন স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন চলচ্চিত্রকার।

আমেরিকার বিখ্যাত চিত্র-সমালোচক স্ট্যানলি কাউফম্যান এই ছবিটি নিয়ে বলেছিলেন, 'খারিজ সমস্ত পরিবারটাকেই খারিজ করেছিল। সমগ্র মানুষের বিরুদ্ধেই এই ছবিটি' (সেন। ২০১১, পৃষ্ঠা-১৬৪)।

খারিজ ছবিটি শেষ হবার পর বেশ কিছু রক্ত গরম তরুণ শেষ দৃশ্য সম্পর্কে আপত্তি করেছিল যে পালানের বাবা কেন ছেড়ে দিল পরিবারটিকে? কেউ কেউ চাইছিল, পালানের বাবার উচিত ছিল ওই পরিবারের কর্তার গালে চড় মারা—এ ধরনের প্রতিক্রিয়ায় মৃণাল সেনের বক্তব্য ছিল- 'পালানের বাবার নীরবতাই চড় মেরেছে সবাইকে। এ মধ্যবিত্ত সমাজকে' (সেন। ২০১১, পৃষ্ঠা-১৬৬)।

উপসংহার

মধ্যবিত্ত শ্রেণি প্রকৃতপক্ষে কেমন? তাদের আত্মঅহমিকা আছে, কিন্তু সাহস নেই। অন্যের কথার জবাব দেয়ার ক্ষমতা নেই কিন্তু আত্মসম্মান ও মর্যাদায় তারা অনড়। এই বৈশিষ্ট্যই যেমন তাদের আলাদা করে, তেমনই করে প্রশ্নবিদ্ধ। মৃণাল সেনের এই তিনটি চলচ্চিত্র গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে আমরা মধ্যবিত্ত শ্রেণির বাস্তবতার এই চিত্রটিই যেন দেখতে পাই। একইসাথে চলচ্চিত্রকার মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবনধারণ ব্যবস্থাকে চিত্রায়িত করার পাশাপাশি বিভিন্ন কারণে সমাজে তাদের যেভাবে হেনস্তার শিকার হতে হয়, সেটিও সুনিপুণ দক্ষতায় তুলে ধরেছেন। মধ্যবিত্ত সমাজে একজন কর্মজীবী নারীকে কীভাবে প্রতিনিয়ত হেনস্তা হতে হয়, তা যেমন দেখিয়েছেন, আবার প্রতিবাদমুখর, বিক্ষোভে টালমাটাল সময়েও কীভাবে মধ্যবিত্ত তরুণেরা ভোগবাদী আদর্শে নিজেদের নিমজ্জিত করে রাখে, সেটিও সচেতনভাবে তুলে এনেছেন। আবার বিপদের সময় নিজের পিঠ বাঁচিয়ে চলে অন্যের ওপর দোষ চাপানোর যে প্রবণতা মধ্যবিত্ত শ্রেণি ধারণ করে, সেটিও সুনিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। সহানুভূতি ও সমানুভূতির অভাব, দায়িত্ব এড়িয়ে চলার প্রবণতা, অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিজে বাঁচতে চাওয়া ও বাস্তবতার সম্মুখীন হতে অনিচ্ছা– মধ্যবিত্ত শ্রেণির এই বৈশিষ্ট্যগুলোই বড় আকারে ধরা পড়েছে মৃণাল সেনের ক্যামেরায়। সব দিক বিচার-বিশ্লেষণ করে তাই বলা যায়, মধ্যবিত্ত সমাজের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো মৃণাল সেনের চলচ্চিত্রে নিখুঁতভাবেই উপস্থাপিত হয়েছে।

নিবন্ধটি শুরু করা হয়েছিল মৃণাল সেনের একটি বক্তব্য দিয়ে, শেষ করা হলো তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ *তৃতীয় ভুবন*-এ তাঁর নিজের করা প্রায় সব চলচ্চিত্রের সম্পর্কে একটি মূল্যায়ন দিয়ে। বইটির ব্যাককভারে একটি উদ্ধৃতিতে তিনি বলেছেন, 'আই অ্যাম গ্রোয়িং ইন এভরি ফিল্ম। সে কারণেই আমার পুরোনো ছবি সম্পর্কে বেশ ক্রিটিক্যাল। মাঝে মাঝে মনে হয় যদি পুরো ছবিটাকেই ড্রেস রিহার্সাল মনে করে আবার তুলতে পারতাম'। নিজের কাজ সম্পর্কে এমন অকপট আত্মসমালোচনা করতে পারার ক্ষমতাই বোধ করি মৃণাল সেনদের মতো কিংবদন্তীদের অনন্য করে তোলে; করে তোলে বাকিদের চেয়ে আলাদা।

তথ্যপঞ্জি

আলাউদ্দিন, মোহাম্মদ (2009)| *সামাজিক গবেষণা: বৈজ্ঞানিক* জ্ঞান অন্বেষণ *পদ্ধতি* ।রোদেলা প্রকাশনী।

আহমদ, চৌধুরী মুফাদ (২০১৮)। মৃণাল সেনের চোখ ও মধ্যবিত্ত সমাজ। *প্রথম আলো।* সংগৃহীত ২৩ জানুয়ারি, ২০২১

জুনাইদ, নাদির (২০১৪)। *দশটি রাজনৈতিক চলচ্চিত্র: বক্তব্য ও নির্মাণশৈলী।* জনান্তিক।

ভৌমিক, সোমেশ্বর (২০১৫)। মৃণাল সেনের অন্তহীন অন্বেষণ। আউয়াল, সাজেদুল সম্পাদিত, *মৃণালমানস।* রোদেলা প্রকাশনী।

মোকাম্মেল, তানভীর (২০১৮)। আমৃত্যু প্রতিবাদী থাকতে চাওয়া এক চলচ্চিত্রকার মৃণাল সেন। *প্রথম আলো।* সংগৃহীত ২৩ জানুয়ারি, ২০২১

রিবেরু, বিধান (২০১৮) । ইন্টারভিউ: ঔপনিবেশিক জড়তার বিপরীতে মৃণালের প্রতিবাদ। ফিল্ম ফ্রি। সংগৃহীত ২৩ জানুয়ারি, ২০২১

https://www.filmfree.org/2018/05/14/review/2253.php

সেন, মৃণাল (২০১১)। *তৃতীয় ভুবন*। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

সেন, শিলাদিত্ত" (2015)। *মৃণাল সেনের ফিল্মযাত্রা*। প্রতিক্ষণ।

হক, ফাহমিদুল (২০১০)। *জেন্ডার যোগাযোগ*। অস্ট্রিক আর্যু বাঙলায়ন প্রকাশক।

হল, স্টুয়ার্ট (1997)। রেপ্রিজেন্টেশন (হক, ফাহমিদুল কর্তৃক অনূদিত)। (২০১৫)। সংহতি প্রকাশন।

Chatterji, S. A. (2020). 'I Wish I Could Start from Scratch'. *Rediff.com.* Retrieved 23 January 2021, from

Jalal, S. H. (2018). Mrinal Sen: The extraordinary chronicler of middle class life. *The Statesman.* Retrieved 23 January 2021, from

Shahid, S. N. (2019). Mrinal Sen & his `Post-Mortem' of the Postcolonial Bengali Middle-Class.*The Daily Star.* Retrieved23 January 2021, from

Singh, Y.K. (2006). *Fundamental of Research Methodology and Statistics.*New Age International Limited Publishers.

https://www.prothomalo.com/opinion/column/%E0%A6%AE%E0%A7%83%E0%A6%A3%E0%A6%BE%E0%A6%B2-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A7%8B%E0%A6%96-%E0%A6%93-%E0%A6%AE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C

https://www.prothomalo.com/entertainment/%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%81-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%80-%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%8F%E0%A6%95-%E0%A6%9A%E0%A6%B2%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0

https://www.rediff.com/movies/special/mrinal-sen-i-wish-i-could-start-from-scratch/20181230.htm

https://www.thestatesman.com/entertainment/mrinal-sen-extraordinary-chronicler-middle-class-life-1502720929.html

https://www.thedailystar.net/star-weekend/tribute/news/mrinal-sen-his-post-mortem-the-postcolonial-bengali-middle-class-1685677